ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাংলার যশোর জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনঃ একটি পর্যালোচনা

ড. মো: আমিরুল ইসলাম *

Abstract: *From the ancient period till advent of the British, 'village' kept being the smallest association of different states in Bengal as well as in the Indian sub-continent. This 'village' was meant the 'self-sufficient village community'. In those days, local government administration was actually vested with 'Morol' the leader of the village. But a comprehensive change took place in local self-administration after the British had occupied India. The present article deals with the steps taken in local self-administration during the British period in India. To serve the purpose, self-administration of greater Jessore district under the British rule has been analyzed.*

রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক সময় প্রশাসনিক কার্যাবলীকে একাধিক ইউনিটে বিভক্ত করে থাকে। এ বিভক্তি প্রক্রিয়াকে দুটি ভাগে চিহ্নিত করা যেতে পারে; এর একটি হচ্ছে কেন্দ্রীকরণ, অপরটি বিকেন্দ্রীকরণ। সরকারের নিম্ন পর্যায় হতে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সংকোচন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীকরণ বলে; এবং যখন কেন্দ্র থেকে ক্ষমতা নিম্ন পর্যায়ের প্রশাসনিক স্তরে বিস্তৃত করা হয়, তখন তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে। অর্থাৎ এটি কেন্দ্রীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার তখন কিভাবে নিম্নস্তরের প্রশাসনিক ইউনিটগুলো নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হবে তার জন্য প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরী করে। প্রাচীন বাংলায় তিন ধরনের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলো হলো- কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ক্ষমতা ও প্রতিযোগিতামূলক স্থানীয় সরকার। ঐ সময় রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম সংস্থা ছিল গ্রাম। গ্রামের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করতো গ্রাম প্রধান বা মোড়ল। এছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন পেশার মানুষের উপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হতো। এ সময় কৃষি ও হস্তশিল্পের সমন্বয়ে গ্রামগুলো অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠে। ফলে এক ধরনের স্বায়ত্তশাসনের উদ্ভব হয় যার কিছু কিছু নিদর্শন মুসলিম শাসন আমলেও ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা ক্ষমতা দখলের পর নিজেদের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য প্রচলিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোকে অবজ্ঞা করে নিজেদের দেশের প্রশাসনের অনুকরণে

* সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, উত্তরা, ঢাকা

কোন জেলা বা অঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা আলোচনার মাধ্যমে একটি দেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। সে উদ্দেশ্যে যশোর জেলার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা আলোচনার জন্য মনোনিত করা হয়েছে।

যশোর জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কি এবং ব্রিটিশ পূর্ববর্তী বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা দেওয়া প্রাসঙ্গিক। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হচ্ছে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত কোন ক্ষুদ্র এলাকার সরকার ব্যবস্থা। এ সরকার ব্যবস্থার শীর্ষে কেন্দ্রীয় এবং নিম্নে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার। গ্রামীণ প্রশাসনিক স্তরগুলো মূলত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে যখন স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা না হয়ে এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তা স্বায়ত্তশাসন হিসেবে আখ্যায়িত হয়।[১] স্থানীয় সরকার সরকারি কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত হলেও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সদস্য বা প্রতিনিধিবৃন্দ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানোত্তরকালে অধিকাংশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিনিধিবৃন্দ সরকারি কর্মকর্তা দ্বারা মনোনীত বা নির্বাচিত হতো। এ মনোনয়নের প্রক্রিয়াটি গ্রামীণ ও নগর উভয় স্তরে কার্যকরী ছিল।

বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামো একদিনে গড়ে উঠেনি। অনেক ধাপ বা স্তর অতিক্রম করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার একটা নির্দিষ্টরূপ লাভ করেছে; এর পিছনে রয়েছে সুদূর প্রসারী ইতিহাস। মনু, কৌটিল্য, শুক্রাচার্য প্রমুখের রচনাবলী থেকে ভারতের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনামলে গ্রামগুলো স্বাধীন ছিল। গ্রামের প্রধান পরিচালক ছিলেন গ্রামিক।[২] অনুরূপভাবে মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকেও প্রাচীন ভারতের পৌর স্বায়ত্তশাসনের ধারণা পাওয়া যায়।[৩] মুসলমানদের আগমনের প্রাথমিক পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের তেমন চিত্র মেলে না। তবে বখতিয়ার খলজীর লখনাবতী বিজয়ের পর তাঁর অধিকৃত অঞ্চল বিভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি অঞ্চলে একজন করে সেনাপতি নিয়োগ করেন। প্রত্যেক বিভাগকে ইকতা এবং ইকতার শাসনকর্তাকে মূকতা বলা হতো।[৪] বখতিয়ার খলজীর মৃত্যু-পরবর্তী বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে কোন স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু জালাল উদ্দীন আবুল মুজাফফর শাহের (১৪৮১-১৪৮৬ খ্রি.) সোনারগাঁ শিলালিপিতে।[৫] থানা এবং সাতগাঁ শিলালিপিতে (১৪৮৪ খ্রি.)।[৬] আরসাহ, থানা ও মহল নামে প্রশাসনিক বিভাগের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৫ খ্রি.) সিলেট শিলালিপি (১৫০৫খ্রি.) ও সোনারগাঁ (১৫১৫খ্রি.) শিলালিপিতেও ইকলীম ও মহলের উল্লেখ আছে।[৭] এসব শিলালিপির উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, সুলতানি আমলের

ইকলীম, আরসাহ্, শিক, মহল, থানা প্রভৃতি প্রশাসনিক ইউনিটের অস্তিত্ব ছিল যা বর্তমানের বিভাগ, জেলা, মহকুমা (বর্তমানে জেলা) এবং থানার সাথে তুলনীয়। এ প্রশাসনিক বিভাজন ব্যতীত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী থেকে। [৮]মোগল শাসকরা ছিলেন শহরমুখী। তাঁরা স্থানীয় বা গ্রামীণ শাসনের প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাঁরা প্রশাসনিক সুবিধার কথা বিবেনা করে সমগ্র শাসন কাঠামোকে সুবা, সরকার, পরগণা এবং মহলে বিভক্ত করেন। [৯]এ বিভাগগুলোকে বর্তমানের প্রদেশ, জেলা, থানা এবং ইউনিয়নের সাথে তুলনা করা হয় যা সুলতানি আমলের প্রশাসনিক বিভাজনের সঙ্গেও অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। মোগলরা গ্রাম্য বা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেননি। স্থানীয় সকল বিষয় সমাধানের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল জনগণের উপর। [১০]জনগণ তাদের মনোনীত গ্রাম প্রধানের মাধ্যমে স্থানীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশাচার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি মীমাংসা করতো। [১১]গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রাম পরিষদ। এই গ্রাম পরিষদ পঞ্চায়েত নামে পরিচিত ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও বর্ণ ভিত্তিক হতো। অনেক সময় সমগ্র গ্রামের জনসাধারণের জন্য একটি পঞ্চায়েত গঠিত হতো। আর্থিক স্বচ্ছলতা, আভিজাত্য, বয়স এবং অন্যান্য গুণাবলী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। [১২]গ্রামবাসী কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়ে প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো। অত:পর সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতো। [১৩]কোন প্রস্তাবের পক্ষে সদস্যরা উচ্চস্বরে সম্মতি দান করতো। এ সম্মতি দান পদ্ধতিকে নির্বাচন হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। কোন জরুরি বিষয় মীমাংসার জন্য গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতো। এছাড়া অনেক উপ-কমিটি ছিল যারা প্রত্যেকেই পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করতো। উল্লেখ্য, এ সময় গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন অফিস বা কাচারী ছিল না। গ্রাম প্রধান বা মোড়লের বাড়িতে কিংবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে সাধারণত সভা-সমাবেশ হতো। মুকাদ্দম গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি ছিলেন। তিনি অনেকটা বেসরকারি কর্মচারীর মত ছিলেন। গ্রাম থেকে আদায়কৃত রাজস্বের ২.৫ ভাগ নিজের বেতন হিসেবে গ্রহণ করতেন। [১৪]বস্তুত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন স্থানীয় বেসরকারি কর্মকর্তা। পঞ্চায়েতের সভাপতি উপরের সকল কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।

মোগল সম্রাট আকবর-এঁর মন্ত্রী রাজা টোডরমল ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলাকে ১৯টি সরকারে এবং ৬৮২টি মহলে বিভক্ত করেন। [১৫]১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে এ মহলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫০ হয়। [১৬]মাহমুদাবাদ ছিল সুবা বাংলার সরকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। [১৭]সুলতানি বাংলার মাহমুদাবাদ শহরের নাম অনুসারে মোগল আমলে মাহমুদাবাদ নামকরণ হয়েছিল বলে মনে হয়। [১৮]নলদী, সাতৈর, মাহমুদশাহী, নসরতশাহী প্রভৃতি এর মহল ছিল। [১৯]মাহমুদাবাদে মহলের সংখ্যা ছিল ৮৮। বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে

বলা যায় যে, সরকার মাহমুদাবাদের উত্তরে সরকার বারবাকাবাদ, উত্তর-পূর্বে বাজুহা সরকার, দক্ষিণে খলিফাতাবাদ সরকার, পূর্বে ফতেহাবাদ সরকার এবং পশ্চিমে সাতগাঁ সরকার। [২০]কাজেই এটা বলা অসমীচীন হবে না যে, আলোচিত অঞ্চলের মধ্যে উত্তরে মাহমুদাবাদ সরকার, দক্ষিণে খলিফাতাবাদ সরকারের কিছু অংশ এবং পূর্বে ফতেহাবাদ সরকারের অংশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে বৃহত্তর যশোর জেলাকে ১০৩টি পরগণায় বিভক্ত করে এবং এর মধ্যে ৫৩টি পরগণা বর্তমান যশোরের মধ্যে ছিল। [২১]ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ব্রিটিশরা শাসনভার গ্রহণ করে এদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপক পরিবর্তন করে। পূর্বে পঞ্চায়েত গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সরকার কর্তৃক আরোপিত কর সংগ্রহ করতো। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ করলে সমাজে এক নতুন শ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি হয়। [২২]এসব জমিদার স্থানীয় বিষয়াদি পরিচালনাসহ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করতো। [২৩]অপরদিকে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়। জমিদাররা শুধু কর আদায়ের দায়িত্বই লাভ করে নাই, স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাও তাদের হস্তগত হয়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি আইন পাসের মাধ্যমে ভারত শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করলে কোম্পানির ক্ষমতা লোপ পায়। এ সময় ব্রিটিশ সরকার গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ঘোষণার মধ্য দিয়ে অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্থানীয় উন্নয়নের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর কিছু ক্ষমতা অর্পন করা আবশ্যক। [২৪]এ ধারাবাহিকতায় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেয়র তাঁর অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। [২৫]বস্তুত এ প্রস্তাব অনুমোদনের মধ্য দিয়ে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার ভাবমূর্তি অনেকটা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন পাশ হয়; যা ছিল বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ। এ আইনের ধারা মোতাবেক গ্রাম এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়। জেলা প্রশাসক এ পঞ্চায়েতের সদস্যদের মনোনয়ন দিতেন। পঞ্চায়েতের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ছিল সাত জন এবং সর্বোনিম্ন সদস্য ছিল তিন জন। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতেন। [২৬]পঞ্চায়েত গ্রাম চৌকিদারদের সহযোগিতায় এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি কর আদায়ের কাজ করতো। চৌকিদারদের বেতন ভাতার জন্য চৌকিদারী কর নামে এক প্রকার কর জনগণের উপর আরোপ করা হয়। পঞ্চায়েত চৌকিদারদের নিয়োগ ও গ্রাম অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করতো। এ কারণে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের গ্রাম চৌকিদারী আইনকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি বলা হয়। [২৭]এ চৌকিদার আইন প্রতিষ্ঠার ফলে গ্রাম তথা তৃণমূল পর্যায়ে একটা স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো তৈরী হয় সত্য। তবে কোন এলাকার উন্নয়নের জন্য তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ

সৃহীত হয়নি। পঞ্চায়েতের সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। ফলে, তারা জনগণের জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে যে কোন ব্যক্তিকে সদস্যপদ গ্রহণে বাধ্য করতে পারতেন। তবে কোন ব্যক্তি সদস্যপদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ব্যবস্থা ছিল। [২৮]চৌকিদার পঞ্চায়েতের সদস্য কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতো। কিন্তু চৌকিদারকে অপসারণের ক্ষমতা পঞ্চায়েতের ছিল না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ দায়িত্ব পালন করতেন। [২৯]নিজস্ব কর্মচারীর উপর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। ধনী ব্যক্তিগণই যেহেতু পঞ্চায়েতের সদস্য হতো; সেকারণে তারা ইচ্ছামত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর করারোপ করতো; যদিও এ প্রক্রিয়ায় ধার্যকৃত করের হার ছিল খুবই সামান্য। এটাই ছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি। তাছাড়া, এ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়নি। এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক সুবিধা আদায় করা। পঞ্চায়েতের সদস্যগণ জনগণের কল্যাণের প্রতি তেমন কোনও নজর দেয়নি। ফলে, বহুবিধ কারণে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

[৩০]লর্ড রিপণ ভারতবর্ষে আসার পর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মে একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাবনা ঘোষণা করেন। এ প্রস্তাবনায় তিনি গ্রাম এলাকায় জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ইউনিয়ন কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। তাঁর মতে এ ইউনিয়ন কমিটির কাজ হবে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট তৈরী ও মেরামত, পুকুর সংস্কার ও খনন, কবর স্থান, শশ্মানঘাট ও অন্যান্য জনহিতকর কাজের সুপারিশ করা। এ প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে নতুন আইন গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়। এ বিষয় তদারকি করার জন্য তৎকালীন হাওড়া জেলা প্রশাসক ই.কে. ওয়েষ্টম্যানকে অফিসার নিয়োগ করা হয়। গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা, হলে কি অবস্থায় তা করা সম্ভব এবং বাস্তবায়িত হলে তা জনগণের কতটুকু কল্যাণে আসবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করার জন্য ই.কে. ওয়েষ্টম্যানকে এ বলে নির্দেশ দেয়া হয় যে তিনি যেন দ্রুত এর উপর একটি প্রতিবেদন তৈরী করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। এ উদ্দেশ্যে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় পরীক্ষামূলকভাবে ১৮০টি ইউনিয়নে কমিটি গঠন করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জনগণ এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় কতটা আগ্রহশীল ও সহযোগিতা করতে পারবে এবং সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে সক্ষম হবে কিনা তা নিয়ে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করা। তাই পরীক্ষামূলকভাবে এ ইউনিয়ন কমিটিগুলোতে ভোট অনুষ্ঠিত হলে জনগণের পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। কার্যত মি.ই.কে. ওয়েষ্টম্যানকৃত সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এক প্রস্তাবনার মাধ্যমে ইউনিয়ন কমিটির বিষয় গ্রহণ করেন। তবে দুই-একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (লে. জেনারেল) বিরোধিতার কারণে আইনটি পাশ হতে বিলম্ব হয়। অত:পর ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিলটি পুনরায় উত্থাপিত হলে ৬ এপ্রিল

বঙ্গীয় আইন পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে পাশ হয়। [৩১]এ আইন ছিল ভাইসরয় লর্ড রিপণের সুপারিশের ফল। রিপণের শাসনামলের সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্কার।

[৩২]এ আইনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলার জনসাধারণকে তাদেরও স্থানীয় বিষয়াদি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা এবং দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। [৩৩]এ আইন প্রণীত হবার পর তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে। প্রতিটি জেলায় জেলাবোর্ড, প্রতি মহকুমায় লোকাল বোর্ড এবং প্রতি ইউনিয়নে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ইউনিয়ন কমিটির সদস্যগণ মনোনীত ছিলেন না। তাঁরা ইউনিয়নের প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। তবে সদস্যসংখ্যা ৫জনের কম বা ৯জনের বেশি হতো না। [৩৪]এ আইনের মাধ্যমে লর্ড রিপণের ইচ্ছার প্রতিফলিত ঘটেছে বলে তাঁকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

[৩৫]ব্রিটিশ শাসনামলে জেলা ছিল মূল প্রশাসনিক একক। জেলা সৃষ্টির পর থেকে প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হওয়ার পর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর জেলা কমিটিকে জেলা বোর্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রতিটি মহকুমায় মনোনীত সদস্যদের নিয়ে একটি লোকাল বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা ছিল। জেলা বোর্ডের সভাপতিত্ব করতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি লোকাল বোর্ড নিয়ন্ত্রণ ও দেখাশুনা করতেন। জেলা বোর্ড গঠিত হতো মনোনীত সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী এবং লোকাল বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা। জেলা বোর্ডের নির্বাচন পরোক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হতো। ১৮৮৬-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লোকাল বোর্ড ইলেক্টোরাল কলেজ হিসেবে কাজ করে। জেলা বোর্ডের ৬০% সদস্য লোকাল বোর্ডের সদস্য হতো। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে লোকাল বোর্ড বিলুপ্ত করা হয়। অত:পর জেলা বোর্ডের ২/৩ অংশ সদস্য নির্বাচিত এবং ১/৩ অংশ সদস্য মনোনীত হতো। বিভাগীয় কমিশনার এ মনোনয়ন দান করতেন। মনোনীত সদস্য ছিল দুই ধরনের যথা- সরকারি ও বেসরকারি। তবে মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা পঞ্চাশ ভাগের বেশি ছিল না। [৩৬]জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ ২৫ জন সদস্য নিয়ে জেলা বোর্ড গঠিত হতো। এর মধ্য থেকে ৬জন সরকার কর্তৃক মনোনীত, ১২জন নির্বাচিত এবং পদাধিকারবলে ছিলেন ৭জন সদস্য। [৩৭]১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলা বোর্ডে নির্বাচিত সদস্যরা হলেন- যশোর সদর লোকাল বোর্ডের রাজা গয়ানন্দ কান্তি রায়, বাবু নবকুমার চৌধুরী, বাবু সতীশবার বোস, ঝিনাইদহ লোকাল বোর্ডের বাবু কালিনাথ মুখার্জী, বাবু বাদিকা চরণ দত্ত, মাগুরা লোকাল বোর্ডের বাবু বসন্ত কুমার বোস ও ভবানন্দ চক্রবর্তী, নড়াইল লোকাল বোর্ডের বাবু বঙ্গসী ধর সেন, বনগাঁ লোকাল বোর্ডের বাবু মন্মত কুমার বোস, গয়ানন্দ বোস, সুশীলেন্দ্র মুখার্জী। এছাড়া যে সকল সরকারি কর্মকর্তা জেলা বোর্ডে ছিলেন তারা হলেন- ডেপুটি কালেক্টর নড়াইল মহকুমা কর্মকর্তা, ঝিনাইদহ মহকুমা কর্মকর্তা, মাগুরা মহকুমা কর্মকর্তা, সিভিল মেডিকেল অফিসার, ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর

প্রমুখ।

[৩৮]১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য জেলাকে মহকুমায় বিভক্ত করার এক পরিকল্পনা সৃহীত হয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলাকে পর্যায়ক্রমে মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। উইলিয়াম বেন্টিং-এর সময় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করে মহকুমা প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়ে সেখানে প্রেরণ করা হয়। [৩৯]উল্লেখ্য, ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে খুলনাকে মহকুমা করা হয়। এসময় যশোর সদর ও নড়াইলের কিছু অংশ খুলনা মহকুমার শাসনাধীন ছিল। [৪০]অত:পর ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মাগুরা মহকুমা, ১৮৬২ সালে ঝিনাইদহ মহকুমা, ১৮৬০-৬১ সালে নড়াইল মহকুমা এবং ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাগেরহাটকে মহকুমা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। [৪১]১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে যশোরের মধ্য হতে খুলনা ও বাগেরহাট মহকুমা এবং ২৪ পরগণার মধ্য হতে সাতক্ষীরা মহকুমা নিয়ে খুলনাকে একটি নতুন জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। [৪২]এভাবে যশোর জেলার সদর মহকুমার সাথে নড়াইল, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও বনগাঁসহ পাঁচটি মহকুমা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের স্বায়ত্তশাসন আইনে মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড গঠন করা হয়। এ লোকাল বোর্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো এবং আরও বলা হয় যে, সর্বনিম্ন ৬জন সদস্যের কমে এ বোর্ড গঠিত হবে না। অনেক ক্ষেত্রে এর সদস্য সংখ্যা ৯-৩০জনের মধ্যে ছিল। এর দুই-তৃতীয়াংশ জনগণের সীমিত ভোটে নির্বাচিত হতো। বাকিটা সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হতো। মহকুমার অন্তর্গত প্রতিটি থানা থেকে একজন করে লোকাল বোর্ডের সদস্য রাখার বিধান রাখা হয়। সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। উল্লেখ্য, এলাকায় বসবাসকারী যে কোন পুরুষ নাগরিক যিনি বার্ষিক ৫/- টাকা কর দিতে সক্ষম তিনি লোকাল বোর্ডের সদস্য হওয়ার জন্য নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। এর জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এর সমীপে প্রতিনিধিত্বকারীর ৫০/- জমা দিতে হতো। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা জমা না দিলে নির্বাচন কমিশনার মনোনয়ন পত্র বাতিল বলে ঘোষণা করতো। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের কোন সদস্য অপসারণ কিংবা অন্য কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত। লোকাল বোর্ডের কার্যকালের মেয়াদ ছিল ৪ বছর। লোকাল বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান থাকত যিনি সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন এবং মাসিক সভায় সভাপতিত্ব করতেন। বস্তুত লোকাল বোর্ডের মূল কাজ ছিল নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। অধিকন্তু, কোন বিষয় ইউনিয়ন কমিটিতে অমীমাংসিত থাকলে তা মীমাংসার জন্য লোকাল বোর্ডে প্রেরণ করা হতো। এছাড়া রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা, পাহারার ব্যবস্থা, জল নিষ্কাষণ, কবরস্থান ও শশ্মানঘাট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনের মধ্য দিয়েই লোকাল বোর্ড তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকত।

লোকাল সেলভ গভর্ণমেন্ট অ্যাক্ট ৩ এর অধীনে লেকাল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় যশোর জেলা বোর্ডের অধীনে যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল এবং বনগাঁ লোকাল

বোর্ড ছিল। যশোর লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮জন; এদের মধ্যে ৫জন নির্বাচিত এবং ১৩জন সরকার কর্তৃক মনোনীত। ঝিনাইদহ লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৯জন; এদের মধ্যে ২জন নির্বাচিত, ৭জন সরকার কর্তৃক মনোনীত। মাগুরা লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৯জন; এদের মধ্যে ৪জন নির্বাচিত, ৫জন সরকার কর্তৃক মনোনীত। নড়াইল লোকাল বোর্ডের ৯জন সদস্যের মধ্যে ৩জন নির্বাচিত এবং ৬জন সরকার কর্তৃক মনোনীত। বনগাঁ লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১২জন; এদের সকলেই ছিলেন সরকার কর্তৃক মনোনীত।

[৪৩]১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলার লোকাল বোর্ডগুলোর [৪৪]নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে সদর লোকাল বোর্ড থেকে ১২জন, নড়াইল লোকাল বোর্ড থেকে ৬জন, মাগুরা লোকাল বোর্ড থেকে ৬জন এবং বনগাঁ [৪৫]লোকাল বোর্ড থেকে ১০ জনসহ মোট ৪০জন সদস্য নির্বাচিত হয়। এর মধ্যে একজন মাত্র মুসলামান সদস্য ছিলেন। আর বাকি ঊনচল্লিশ জন সদস্য ছিলেন হিন্দু। এছাড়া বিভিন্ন লোকাল বোর্ডে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যরা হলেন- সদর লোকাল বোর্ডের রাজা গয়ানন্দ, কান্তরায়, যদুনাথ মজুমদার, উমেশচন্দ্র ঘোষ, ধরণীধর হালদার, আর. এইচ. ট্রিগলিম, সৈয়দ আহম্মদ; নড়াইল লোকাল বোর্ডের যগেন্দ্রনাথ সেন, বিপিণ বিহারী বোস, কিরণচন্দ্র রায়, ঝিনাইদহ লোকাল বোর্ডের মি. চার্লস টুইডি, হরনাথ চ্যাটার্জী, রামরতন ঘোষ চৌধুরী; মাগুরা লোকাল বোর্ডের মি. জে.এইচ. ও টম, মৌলবী আফসার উদ্দীন খান চৌধুরী, তারেক চন্দ্র সেন; বনগাঁ লোকাল বোর্ডের গয়ানন্দ সরকার বোস, কামকানাথ আচার্য, সুরানাথ চৌধুরী, হরিশচন্দ্র রায় ও বামাচরণ বোস। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে সকল থানায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচন পরিচালনা করতো। [৪৬]সরকার লোকাল বোর্ডের জন্য ভিন্ন ভিন্ন থানা থেকে ৪০জন সদস্য মনোনীত করতো। এ সকল মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জমিদার, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শক, নীল ব্যবসায়ী, ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। বলাই বাহুল্য, সরকারের মনোনীত সদস্যদের মধ্যে একজন মুসলমান ছিলেন। এছাড়া লে. গর্ভনরের নির্দেশে আরও ২০জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ২০জন সদস্যের মধ্যে সদর লোকাল বোর্ডে ৬জন, নড়াইল লোকাল বোর্ডে ৩জন, মাগুরা লোকাল বোর্ডে ৩জন এবং বনগাঁ লোকাল বোর্ডে ছিলেন ৫জন সদস্য।

[৪৭]১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলার লোকাল বোর্ডের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে সদর লোকাল বোর্ডের বিভিন্ন থানা থেকে যারা নির্বাচিত হন তারা হলেন- কতোওয়ালী থানার বাবু নবকুমার মুখার্জী, মুনশী তোফেল উদ্দীন খন্দকার, চৌগাছা থানার বি. নাথ ঘোষ, কেশবপুর থানার কর্তিক চন্দ্র ঘোষ, শশীনাথ বিশ্বাস, মনিরামপুরের গোপাল চন্দ্র কর, নওপাড়ার যদুনাথ চক্রবর্তী, বাঘারপাড়ার হরিদে নাথ দত্ত, গদখালীর মহেন্দ্রনাথ সেন, বামানাথ দত্ত; বনগাঁ লোকাল বোর্ডের সদর থানার গঙ্গাচরণ চ্যাটার্জী, জগবন্ধু চ্যাটার্জী, মহেশপুরের বিহারী লাল মুখার্জী বিশ্বেস্বর ভট্টাচার্য, গড়পোতার মহেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী,

কাজী নূরুল হক, শার্শার মানিক চন্দ্র মিশ্রী, মহেন্দ্র নাথ রায়, গয়ঘাটার শুশীলেন্দ্র মুখার্জী, ফটিক চন্দ্র চৌধুরী, মাগুরা লোকাল বোর্ডের মহম্মদপুর থানার কেদার নাথ ঘোষ, কাজী গহর আলী, শালিখার দূর্গাপ্রসন্ন দাস, মাগুরা সদর থানার নিপেন্দ্র নাথ পাল, কৈলাশ চন্দ্র দত্ত, অম্বিকাচরন সরকার; নড়াইল লোকাল বোর্ডের সদর থানার বসন্তলাল দত্ত, কমল কৃষ্ণ দত্ত, গঙ্গা কুমার মিত্র, যগেশ্বর ভট্টাচার্য, কালিয়ার বাবু বংশধর সেন; ঝিনাইদহ লোকাল বোর্ডের শৈলকুপা থানার কেদার নাথ, গতিনাথ মৈত্র, ঝিনাইদহ সদর থানার মহেন্দ্র নাথ সেন, কেশব চন্দ্র চ্যাটার্জী, হরিণাকুণ্ডুর পূর্ণচন্দ্র মল্লিক, কোটচাঁদপুরের প্রীয়নাথ মুখার্জী। তবে কালীগঞ্জ ও লোহাগড়া থানার নির্বাচন অনেক পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য ছাড়াও লোকাল বোর্ডগুলোতে সরকার আরও চল্লিশজন সদস্য মনোনীত করে। এসকল সদস্য স্থানীয় জমিদার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার ছিলেন। এছাড়া ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের স্বায়ত্তশাসন আইনের তৃতীয় ধারা বলে লে. গভর্ণর জেনারেল সদর লোকাল বোর্ডে ৬ জন, বনগাঁয় ৫জন, মাগুরায় ৩জন, নড়াইলে ৩জন এবং ঝিনাইদহে ৩জন সদস্য মনোনীত করেন।

[৪৮]১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সদর লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে যশোর সদর থেকে ১২জন সদস্য নির্বাচিত ও ৬জন মনোনীত, ঝিনাইদহ থেকে ৬জন নির্বাচিত ও ৩জন মনোনীত, মাগুরা থেকে ৬জন নির্বাচিত ও ৩জন মনোনীত, নড়াইল থেকে ৬জন নির্বাচিত ও ৩জন মনোনীত এবং বনগাঁ থেকে ১০জন নির্বাচিত ও ৫জন মনোনীত মোট ৬০জন সদস্য ছিল। এর মধ্যে ২০জন সরকার কর্তৃক মনোনীত, আর বাকি ৪০জন নির্বাচিত। উল্লেখ্য, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্বায়ত্তশাসন আইনের ৯ নম্বর সেকশনে বলা হয় যে, প্রত্যেক লোকাল বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হবে। [৪৯]এসময় যশোর জেলার রাজস্ব কালেক্টর ই.ডব্লিউ মেলোনী যশোর পৌর কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান হন এবং জর্জ কর্কবার্ণ, টি.টি.এলেন, জে.সি.শ, রাজা বরদাকান্ত, রায় বাহাদুর বাবু আনন্দমোহন মজুমদার, বাবু মদনমোহন মজুমদার ও মৌলভী পায়রাতুল্লাহ কমিশনার নিযুক্ত হন। যশোর মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বেসরকারি সভাপতি হন প্যারী মোহন গুহ এবং একই প্রক্রিয়ায় সহসভাপতি হন উমেশ চন্দ্র ঘোষ।

মহকুমার পরের প্রশাসনিক স্তর হিসেবে থানা বিবেচিত হতো। অনেকে থানাকে পুলিশ [৫০]এবং রাজস্ব [৫১]একক হিসেবে অভিহিত করেছেন। বস্তুত থানা সৃষ্টি করা হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য। থানা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের কোন স্তর ছিল না। কিন্তু মহকুমার নিম্নে প্রশাসনের এক স্তর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্থানীয় সরকারগুলো সুগঠনের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিশন গঠন করেন। এ কমিটি Royal Commission নামে পরিচিত। এ কমিশন প্রশাসনের সুবিধার্থে মহকুমার সংখ্যা বৃদ্ধি করা অথবা এসব মহকুমাকে সার্কেলে বিভক্ত করার সুপারিশ করেন। কারণ মহকুমার প্রশাসনের দ্বারা এত বড় এলাকার শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। এ সুপারিশ ও নানাবিধ অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে লোকাল বোর্ড বা

মহকুমাকে একাধিক সার্কেলে বিভক্ত করা হয়। মহকুমার নিম্ন স্তর হলো সার্কেল। প্রতিটি সার্কেলের জন্য একজন করে সার্কেল অফিসার বা সি.ও. (Circle Officer) থাকবেন। প্রথম দিকে ২/৩টি থানা নিয়ে একটি সার্কেল গঠন করা হয়।[৫২]সার্কেল বোর্ডের ১৫ জন সদস্যের মধ্য থেকে ২/৩ অংশ ইউনিয়ন পঞ্চায়েত সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং বাকি ১/৩ অংশ কমিশনার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। সার্কেল বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল লোকাল বোর্ডের পক্ষে ইউনিয়ন কমিটিকে নিয়ন্ত্রণ করা। তাছাড়া, সার্কেল বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজ করতো।

[৫৩]১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের আইন অনুসারে শুধুমাত্র সিলেট বাদে প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা বোর্ড গঠিত হয়। কিন্তু এসময় সিলেটে লোকাল বোর্ড ছিল। জেলা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতো এবং সদস্য সংখ্যা ছিল ৯জন। এ সকল সদস্য মনোনীত, আংশিক মনোনীত বা নির্বাচিত হতো। যে সকল জেলায় কোন লোকাল বোর্ড ছিল না সেসব জেলা বোর্ডের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো। পক্ষান্তরে, যেখানে লোকাল বোর্ড ছিল সেখানে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হতো লোকাল বোর্ডের সদস্যদের দ্বারা। অর্থাৎ জেলা বোর্ডের সদস্য ছিল দুই ধরনের- সরকারি ও বেসরকারি।[৫৪]সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।[৫৫]কোন সদস্য মৃত্যু বা অপসারিত হলে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো। প্রত্যেক জেলা বোর্ডে একাধিক ভাইস-চেয়ারম্যান থাকতেন। লোকাল বোর্ডের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কিছু স্থায়ী কর্মচারী ছিল তারা জেলা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হতো। এছাড়া একজন সেক্রেটারী ও একজন হিসাব রক্ষক থাকত। জেলা বোর্ডের কাজ ছিল বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ, ইউনিয়ন কমিটি, সার্কেল ও লোকাল বোর্ডে অমীমাংসিত বিষয়াদি নিষ্পত্তি করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারী মোকাবেলা এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি।

[৫৬]পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি হচ্ছে শহর এলাকার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক কাঠামো। বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনিক স্তর হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এবং শহর এলাকার জন্য পৌরসভা বিদ্যমান রয়েছে। ব্রিটিশরা এদেশে প্রথমে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে প্রথম পৌর কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশন-এর বারজন আল্ডারম্যান ভোট দিয়ে মেয়র নির্বাচন করতো। ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির উদ্যোগে কলকাতা ও বোম্বাই শহরে পৌরকর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে পৌর প্রতিষ্ঠার একটি আইন প্রণীত হয়। অত:পর ১৮৫০ সালে ভারতের সর্বত্র পৌরসভা প্রতিষ্ঠার আইন পাশ হয়। পৌরসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হতো এবং এক-তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো। পদাধিকারবলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পৌরসভার চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করতেন। তবে ভাইস-চেয়ারম্যান ভোটের মাধ্যমে নিযুক্ত হতেন।[৫৭]পৌরসভার কাজ পৌর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আওতাধীন বিষয়াদি দেখাশুনা করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে

পৌরসভার রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা, পার্ক-উদ্যান তৈরী করা, বিনোদনের ব্যবস্থা করা, পৌর এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা পৌরসভার কাজের আওতাভুক্ত ছিল।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভা উৎকর্ষ আইন প্রণীত হয়। এ আইনে বলা হয় যে, প্রতিটি বড় বড় শহরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত করা হবে। আইনের তৃতীয় ধারা অনুযায়ী একই বছরে যশোর মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা গঠিত হয়। এ পৌরসভা ১০টি মৌজায় বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো- যশোর, পুরাতন কসবা, ঘোপ, রেন্দি নীলগঞ্জ মুরলী, বেজপাড়া, শংকরপাড়া, চাচড়া ও খড়কী এবং সীমানা নির্ধারিত হয় সাড়ে চার মাইল।[৫৮] পৌরসভা পরিচালনার জন্য ১৮জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির মধ্যে ১২জন সদস্য নির্বাচিত এবং ৬জন সরকার কর্তৃক মনোনীত করার কথা বলা হয়।[৫৯] ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের পৌরসভা আইনের সূত্র ধরে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে কিছু প্রভাবশালী হিন্দু জমিদারদের প্রচেষ্টায় মহেশপুর পৌরসভা প্রতিষ্টিত হয়। এ পৌরসভা পরিচালনার জন্য ১৫জন কমিশনার নিয়ে একটি পৌরসভা বোর্ড গঠন করা হয়। এর মধ্যে ১০জন নির্বাচিত, ৪জন সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ১জন পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান ছিলেন। পৌরসভার সীমানা নির্ধারণ করা হয় ৩ বর্গমাইল।[৬০] অত:পর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কোটচাঁদপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০জন সদস্য নিয়ে এ পৌরসভার বোর্ড গঠন করা হয়। এর মধ্য থেকে ৬জন নির্বাচিত, বাকি ৪জন সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো এবং সীমানা নির্ধারণ করা হয় ৪ বর্গমাইল।

[৬১] ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হয়। এ আইন মালদহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল ব্যতীত প্রদেশের সর্বত্র কার্যকর ছিল।[৬২] গ্রাম স্বায়ত্তশাসন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দুই স্তর বিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী করা হয়। এগুলো হলো ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড যা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের আইনের অধীনে স্থানীয় সরকারের মূল প্রশাসনিক একক ছিল। ইউনিয়ন বোর্ড গ্রাম অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৩] ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যাবলী ছিল দুই ধরনের- বাধ্যগত ও ঐচ্ছিক। চৌকিদার ও দফাদারদের সহায়তায় ইউনিয়নের শান্তি-শৃংখলা বিধান করা ছিল বাধ্যতামূলক এবং জনহিতকর কার্যসাধন ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউনিয়ন বোর্ড সর্বোচ্চ ১০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো। দশ হাজার জনগণ এবং ১০/১৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে এ ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়।[৬৪] সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ৬জন এবং উর্ধ্বে ৯জন হবে।[৬৫] ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করার পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ৯জন; এর মধ্যে ৩জনকে মনোনয়ন দিতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর বাকি ৬জন নির্বাচিত হতেন। সার্কেল অফিসার মনোনয়ন দেয়ার জন্য এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নামের তালিকা তৈরী করতেন। অত:পর এই তালিকা মহকুমা প্রশাসকের দ্বারা পরীক্ষিত ও চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দেয়ার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করতেন। হিন্দু-মুসলমান সমপ্রদায়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ২জন সদস্য মনোনয়ন দিতেন। যেখানে নির্বাচিত মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল সেখানে

২জন হিন্দু মনোনয়ন দিতেন। আবার যেখানে নির্বাচিত হিন্দুদের সংখ্যা বেশি ছিল সেখানে ২জন মুসলমান সদস্য মনোনয়ন দিতেন। [৬৬]বাস্তবে স্থানীয় শাসন কাঠামোতে মুসলমানদের উপস্থিত ছিল কম। উল্লেখ্য, যশোর জেলায় ৫টি ইউনিয়ন কমিটি ছিল। এর মধ্যে কালিয়া এবং কেশবপুর ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে হরিনাকুণ্ডু এবং ১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে ঝিনাইদহ ইউনিয়ন কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া গোড়াপোতা ইউনিয়ন কমিটি হিসেবে কাজ করতো যা পরর্বতীতে বিলুপ্ত হয়। ইউনিয়ন কমিটির কাজ ছিল রাস্তাঘাট সংরক্ষণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর তদারকী এবং গ্রামের পয়:নিষ্কাশন দেখভাল করা।

[৬৭]উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, যশোর বাংলাদেশের প্রাচীন জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ জেলায় মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন ও মুললিম শাসনামলে যে শাসন কাঠামো গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে রাজস্ব আদায়সহ প্রশাসনিক সুবিধার্ধে সমগ্র যশোর জেলাকে পরগণায় বিভক্ত করা হয়েছিল, যা ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথমদিকেও আংশিকভাবে কার্যকর ছিল। কিন্তু ব্রিটিশের গৃহীত স্থিতিশীল রাজনৈতিক প্রশাসনিক নীতি যশোর জেলায় প্রচলিত শাসন কাঠামো ভেঙ্গে নিজেদের মত করে গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিকাশের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। তারা বাস্তবতা বিবর্জিত এক ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো উপহার দেন। তাছাড়া ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে যে স্তর সৃষ্টি করা হয়েছিল তার মধ্যে কোন স্ব-শাসনের অস্তিত্ব না থাকায় যশোর জেলার জনপ্রতিনিধিদের সাথে মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থায় যশোর জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, পৌরকমিটি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। ফলে জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। প্রকৃত অর্থে যশোর জেলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার তেমন বিকাশ হয়নি। প্রশাসনের নিম্নস্তর জেলা, মহকুমা, থানা বা ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হলেও ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক মানসিকতার কারণে সর্বজনীন স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। যশোর জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে যে সকল জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করতেন তাদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। কারণ ব্রিটিশ সরকারের ভেদ নীতির কারণে যশোর জেলার মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষায় হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। ফলে জেলার সাধারণ মানুষ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। তথাপিও ব্রিটিশদের গৃহীত পদক্ষেপ আজকের যশোর জেলা তথা বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের স্তরগুলো প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ করেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার ভিত শক্তিশালী করতে হলে জেলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করতে হবে। কাজেই যশোর জেলা তথা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল সেটিকে সংযোজন-বিয়োজন করে আধুনিক প্রশাসনিক নীতি গ্রহণ করলে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সুফল বয়ে আনবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. ড. মো. মকসুদুর রহমান, বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮), পৃ.৫ ।

২. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রমাণিক, ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি (কলকাতা: শ্রীভুমি পাবলিশিং কোম্পানি, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৩), পৃ. ৬৯০; কামাল সিদ্দিকী(সম্পা.), বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার (ঢাকা: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ১৯৮৯), পৃ.৩ ।

৩. The Imperial Gazetteer of India, Vol. IV (London: Clarendon Pess, 1909), pp. 282-283.

৪. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ.৭৪ ।

৫. Nani Gopal Majumdar, Inscription of Bengal, Volume III (Rajshahi: Varendra Research Soceity, 1929), p. 121 (Henceforth IB)

৬. Ibid, P. 127.

৭. IB, Volume III, pp. 170, 192-193.

৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য Abul Fadl, Ain-i-Akbari, Vol. II, trans. H.S. Jerret (Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1949), pp. 43-44 (Henceforth AA].

৯. I.H. Qureshi, Administration of the Mughal Empire (Karachi: University of Karachi, 1966), p. 227.

১০. Sir Jadunath Sarker, Adminsitration of the Mughal (Calcutta: Sarker and Sons Ltd. 1952), p. 10.

১১. S.A.Q. Husani, Administration under the Mughal (Dacca: Paradise Library, 1952), p. 234.

১২. Ibid, p. 234.

১৩. Ibid.

১৪. Sree Ram Sharma, The Structure of the Mughal Empire (Bombay: Hindu Kitabs Limited, 1951), p. 20.

১৫. AA, vol. II, p. 141.

১৬. H. Blockman, "Contribution to the Geography and History of

Bengal, JASB, Part. III, Calcutta, 1873, pp. 215-216.

১৭. AA, vol, II, pp. 141-146.

১৮. A.B.M. Hussain, "Bara Bazar: Was it the Mohumadabad of Sultani Bangal". Essays in Memory of Momtazur Rahman Trafdar (Dhaka: Dhaka University, 1999), p. 235.

১৯. AA, Vol. II, pp. 144-146.

২০. সাদ আহম্মদ, "বারো বাজারের ইতিহাস ও ঐতিহ্য", অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০) পৃ. ৩৮-৩৯।

২১. W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol. II (New Delhi: D.K. Publishing House, 1973), pp. 320-328.

২২. Cf. Tarachand, History of Freedom Movement in India (New Delhi: Ministry of Information, 1961).

২৩. Md. Moksudur Rahman, ÒEvolution of the Union Parishad as a Self- Government in BangladeshÓ, JIBS, Vol. VII, Rajshahi, 1984, p.24.

২৪. Ibid.

২৫. ড. মো: মকসুদুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।

২৬. তদেব।

২৭. Rokeya Rahman Kabeer, Administrative Policy of the Government of Bangal: 1870-1890 (Dacca: NIPA, 1965), p. 8.

২৮. ড. মো: মকসুদুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

২৯. The Village Chowkidary Act 1870, Section XL.

৩০. JIBS, Vol. VII, p. 26.

৩১. Ibid. pp. 26-27.

৩২. Hugh Tinker, The foundaton local-self government in India,Pakstan and Burma (London, 1924), p. 43.

৩৩. Report on the Administrarion of Bengal, 1885-86 (Calcutta, 1887), p. 80.

৩৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাদেশের ইতিহাস_১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১০), পৃ. ৩৮৭।

৩৫. Najmul Abedin, Local Administration and Politics in Modernizing Societies- Bangladesh and Pakistan (Dacca: NIPA, 1973), P. 42.

৩৬. K.G.M. Latiful Bari, Bangladesh District Gazeteers: Jessore (Dacca: Bangladesh Government Press, 1979), p. 283.

৩৭. L.S.S. O'Malley, Bengal District Gazeteers, Jessore (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1912), p. 131.

৩৮. Printed Proceedings A (Local Self-Governemt) (Dhaka: NAB, Bundle No.7, 1893), p. 2.

৩৯. ড. মকসুদুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪ ।

৪০. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড (কলিকাতা: চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এ্যান্ড কোং, ১৩২১ বাংলা), পৃ. ৬৯৪ ।

৪১. W.W. Hunter, op.cit. pp. 317-319.

৪২. সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৫-৬৯৬ ।

৪৩. L.S.S. O'Malley, op.cit., p. 132.

৪৪. এ লোকাল বোর্ডগুলো হলো- যশোর সদর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও বনগাঁ ।

৪৫. বনগাঁ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল । কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পশ্চিম বাংলার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় ।

বর্তমান যশোর জেলার শার্শা ও মহেশপুর থানা বনগাঁর অধীনে ছিল । সে কারণে আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রে বনগাঁ স্থান পেয়েছে ।

৪৬. Printed Proceedings A (Local Self-Government) (Dhaka: NAB, Bundle no.5, 1889-90), p.1.

৪৭. Ibid., pp. 3-4.

৪৮. Printed Proceedings A (Local Self-Government) (Dhaka: NAB, Bundle no. 7, 1892), pp. 1-3.

৫৯. Printed Proceedings A (Local Self-Government) (Dhaka: NAB, Bundle no. 12, Nos. 3-5, 1913), p.1.

৫০. W.W. Hunter, Statistical Accounts of Bengal, District of Murshidabad and Pabna (Delhi: D.K. Publishing House, Reprint 1974), p. 356.

৫১. L.S.S.O'Malley, Bengal District Gazetteers, Rajshahi (Calcutta:

Bengal Secretariat Press, 1916), p. 129.

৫২. ড. মো. মকসুদূর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭।

৫৩. তদেব।

৫৪. Government of Bengal, Bengal Self-Government Act III of 1885 (Calcutta: Bengal Secretariat Book Deport, 1933), Section 7.

৫৫. Ibid, Section 10A.

৫৬. ড. মো. মহসুদূর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২।

৫৭. তদেব, পৃ. ৬৪-৬৫।

৫৮. K.G.M. Latiful Bari, op. cit., p. 289.

৫৯. Ibid., p. 133.

৬০. Ibid., p. 134.

৬১. L.S.S. O'Malley, op.cit., p. 134.

৬২. Government of Bengal, Administration of Bengal under the Earl of Ronaldshay, 1917-1922 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1922), p. 69.

৬৩. JIBS, vol. VII, p. 33.

৬৪. Ibid,

৬৫.Bengal Village Self- Government Act. V, 1919 (Alipore: Bengal Government Press, 1937), Section 6 (1).

৬৬. JIBS, Vol. VII, p. 36.

৬৭. L.S.S. O'Malley, op.cit, p. 1